৮

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি

৮.১ নির্দেশাত্মক নীতির শ্রেণিবিভাজন;
(ক) রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে নির্দেশ,
(খ) রাষ্ট্রের নীতি রচনার নির্দেশ,
(গ) নাগরিকদের এমন অধিকার যা আদালতে বলবৎযোগ্য নয়,
(ঘ) নীতিগুলির মর্মবস্তু।
৮.২ নির্দেশমূলক নীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য—মৌলিক অধিকারের সঙ্গে তুলনা।
৮.৩ নির্দেশমূলক নীতিসমূহের তাৎপর্য।

ভারতের সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে এই উদ্দেশ্য যথার্থভাবে পূরণ করা সম্ভব কিনা, তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সংবিধান সভার সাংবিধানিক উপদেষ্টা ড. বি.এন. রাউ-এর সুপারিশক্রমে আদালতে বলবৎযোগ্য মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি আদালতে গ্রাহ্য নয় এমন কিছু নীতি সংবিধানের চতুর্থ অংশে ৩৬-৫১ ধারায় লিপিবদ্ধ করা হয়। **এগুলি রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি নামে অভিহিত।**[১] পরবর্তীকালে ৪২তম (১৯৭৬), ৪৪তম (১৯৭৮) এবং সম্প্রতি ৮৬তম (২০০২) সংবিধান সংশোধনের সাহায্যে আরও কয়েকটি নির্দেশাত্মক নীতি সংবিধানে যুক্ত করা হয়েছে।

৮.১. নির্দেশাত্মক নীতির শ্রেণিবিভাজন

বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ বিচারপতি দুর্গাদাস বসু শ্রেণিবিভাজন করে নীতিগুলির বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে, নীতিগুলি তিন ধরনের। যেমন—**(ক) রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে নির্দেশ, (খ) রাষ্ট্রের নীতি রচনা নির্দেশ,** এবং **(গ) নাগরিকদের এমন অধিকার যা আদালতে বলবৎযোগ্য নয়।**[২]

(ক) রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে নির্দেশ

(১) ৩৮(১ ও ২) ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারসম্পন্ন এক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করে নাগরিকদের কল্যাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করবে এবং শুধু ব্যষ্টি নয়, সমষ্টির ক্ষেত্রেও আয়, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য কমানোর চেষ্টা করবে।[৩]

(২) রাষ্ট্র সব কর্মীর কাজের ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত ও মানবিক ব্যবস্থা, মেয়েদের গর্ভধারণকালে সহায়তা, জীবনধারণের উপযুক্ত মজুরি, জীবনযাত্রার উন্নত মান এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করবে [৪২, ৪৩ ধারা]।

(৩) রাষ্ট্র পুষ্টির ও জীবনযাত্রার মানের স্তর উন্নীত করার এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করবে [৪৭ ধারা]।

(৪) রাষ্ট্র এমনভাবে তার নীতি পরিচালনা করবে যাতে সর্বসাধারণের হিতার্থে দেশের পার্থিব সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বণ্টিত হয় এবং ধনসম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণসমূহ কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত না-হয় [৩৯(খ) ও (গ) ধারা]।

১. এক্ষেত্রে সংবিধান রচয়িতারা আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে উল্লিখিত 'রাষ্ট্র পরিচালনার সামাজিক নীতি' (Directive Principles of Social Policy) দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।
২. এ বিষয়ে D.D. Basu : Shorter Constitution নবম অধ্যায় ও সারণি ৬ দ্রষ্টব্য।
৩. ৩৮(২) উপধারাটি ৪৪তম সংশোধনে (১৯৭৮) যুক্ত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

(৫) রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির চেষ্টা করবে [৫১ ধারা]।

(খ) রাষ্ট্রের নীতি রচনার নির্দেশ

নির্দেশগুলি—

(১) কিছু অর্থনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার।

(২) ভারতের নাগরিকদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার [৪৪ ধারা]।

(৩) ছয় বছর পূর্ণ হয়নি এমন সব শিশুদের লালনপালন ও শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের সচেষ্ট হওয়ার [৪৫ ধারা]।[৪]

(৪) স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর উত্তেজক পানীয় এবং মাদক দ্রব্য ভেষজ প্রয়োজন ছাড়া সেবন নিষিদ্ধ করার [৪৭ ধারা]।

(৫) কুটিরশিল্পের উন্নতি করার [৪৩ ধারা]।

(৬) আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও পশুপালন সংগঠন এবং গবাদিপশুর হত্যা নিবারণ করার [৪৮ ধারা]।

(৭) স্বশাসনের একক হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠিত করার [৪০ ধারা]।

(৮) তপশিলভুক্ত জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য দুর্বলতর শ্রেণির শিক্ষাসংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণ করা এবং সামাজিক অবিচার থেকে তাদের রক্ষা করার [৪৬ ধারা]।

(৯) পরিবেশ রক্ষা ও তার উন্নতি করা এবং বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করার [৪৮ক ধারা]।[৫]

(১০) ঐতিহাসিক ও শৈল্পিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সংরক্ষণ করার [৪৯ ধারা]। এবং

(১১) বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথক করার [৫০ ধারা]।

(গ) নাগরিকদের এমন অধিকার যা আদালতে বলবৎযোগ্য নয়

অধিকারগুলি—

(১) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ভারতে প্রত্যেক নাগরিকের উপযুক্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার [৩৯(ক) ধারা]।

(২) সমান কাজের জন্য পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমান বেতন পাবার অধিকার [৩৯(ঘ) ধারা]।

(৩) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার [৩৯(ঙ)-(চ) ধারা]।

(৪) শিশু ও তরুণদের শোষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ[৬] পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে গড়ে-ওঠার সুযোগ [৩৯(চ) ধারা]।

(৫) ন্যায়বিচার ও বিনাব্যয়ে আইনি সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ [৩৯ক ধারা][৭]।

(৬) কর্মের অধিকার [৪১ ধারা]।

(৭) বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে, অসুস্থতায় ও অভাবে সরকারি সাহায্য পাওয়ার অধিকার [৪১ ধারা]।

৪. এটি ৮৬তম সংশোধনের দ্বারা (২০০২) যুক্ত হয়েছে। মূল সংবিধানের ৪৫ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, রাষ্ট্র ছয় থেকে চোদ্দো বছরের বালকবালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। উপরোক্ত সংশোধনে (২০০২) বিষয়টি ২১ক ধারায় যুক্ত হয়ে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৫. ৪২তম সংশোধনে (১৯৭৬) যুক্ত হয়।

Scanned with CamScanner

(৮) কাজের ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত ও মানবিক ব্যবস্থার এবং প্রসূতির সাহায্য পাওয়ার অধিকার [৪২ ধারা]।
(৯) কর্মীদের জীবনযাপনের জন্য উপযুক্ত মজুরি এবং উন্নত জীবনযাত্রার মান যাতে সুনিশ্চিত হয় এমন কাজের অধিকার [৪৩ ধারা] এবং,
(১০) শিল্প পরিচালনায় কর্মীদের অংশগ্রহণের অধিকার [৪৩ক ধারা]।

(ঘ) নীতিগুলির মর্মবস্তু

নির্দেশমূলক নীতিগুলির সারবস্তু সংবিধানের ৩৮ ধারায় বলা আছে। **ওই ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্র সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ন্যায়সংগত এক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে জনকল্যাণের চেষ্টা করবে।** এই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যেসব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রয়োজন বিভিন্ন নির্দেশাত্মক নীতিতে তারই উল্লেখ করা হয়েছে।

৮.২. নির্দেশমূলক নীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য—মৌলিক অধিকারের সঙ্গে তুলনা

নির্দেশমূলক নীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যর আলোচনা প্রসঙ্গে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে নির্দেশমূলক নীতির তুলনা করা প্রয়োজন।

মৌলিক অধিকারের সঙ্গে নির্দেশাত্মক নীতির তুলনা

প্রথমত, **মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রের কার্যাবলির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।** যেমন ১৯(১) ধারায় যে ছয়প্রকার স্বাধীনতার অধিকার ভারতের নাগরিকদের দেওয়া হয়েছে ১৯(২)-(৬) ধারায় সেগুলির ওপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অন্যদিকে, **নির্দেশমূলক নীতিতে রাষ্ট্রকে কিছু সদর্থক দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।** যেমন, তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য দুর্বলতর শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের মানুষের শিক্ষাগত ও আর্থিক স্বার্থের প্রসারের জন্য সচেষ্ট হওয়ার নির্দেশ।

দ্বিতীয়ত, **মৌলিক অধিকার ভোগ করার জন্য আইন-প্রণয়ন করতে হয় না। কিন্তু আইন রচনা করেই নির্দেশমূলক নীতির** রূপায়ণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সব কর্মীর জন্য কাজের ন্যায়সংগত ও মানবিক পরিবেশ, জীবনযাপনের জন্য উপযুক্ত মজুরি প্রভৃতি নির্দেশাত্মক নীতিগুলি রাষ্ট্র রূপায়ণ করতে চাইলে আইন-প্রণয়ন করতে হবে।

তৃতীয়ত, **নির্দেশমূলক নীতি আদালতে বলবৎযোগ্য নয়, কিন্তু মৌলিক অধিকার আদালতে বলবৎযোগ্য।** কারও মৌলিক অধিকার খর্ব বা ক্ষুণ্ণ হলে সে হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করতে পারে। আর্জি যথাযথ হলে আদালত উপযুক্ত নির্দেশ বা লেখ জারি করে তার মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করে। কিন্তু নির্দেশমূলক নীতির ক্ষেত্রে এ সুযোগ নেই। যেমন—কর্মের অধিকার একটি নির্দেশমূলক নীতি [৪১ ধারা]। রাষ্ট্র এই অধিকার সুনিশ্চিত না-করলে কেউ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে না, কারণ নীতিটি আদালতে গ্রাহ্য নয়।

চতুর্থত, **কেন্দ্র বা রাজ্যের আইনসভা মৌলিক অধিকার বিরোধী কোনো আইন-প্রণয়ন করলে সুপ্রিমকোর্ট সেই আইন বাতিল করে দিতে পারে [১৩(২) ধারা]। কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতি বিরোধী কোনো আইন রচিত হলে আদালত তা বাতিল করতে বাধ্য নয়।**

প্রশ্ন হল ঃ মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে বিরোধ বাধলে কার প্রাধান্য থাকবে। এ বিষয়ে **মাদ্রাজ রাজ্য বনাম চম্পকম মামলায় (১৯৫১)** শীর্ষ আদালতের অভিমত, সেক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারকে প্রাধান্য দিতে হবে।[৮]

---

৮. "The Directive Principles of State Policy have to confirm to and run subsidiary to the Chapter on Fundamental Rights." ... Champakam (1951).

পঞ্চমত, মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে গত শতকের সাতের দশকে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। সংবিধানের ২৫তম সংশোধনে (১৯৭১) মৌলিক অধিকারের ব্যতিক্রমরূপে সংবিধানে ৩১গ ধারা যুক্ত করা হয়েছে। এই ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৩৯(খ) ও (গ) ধারায় যে নির্দেশমূলক নীতির কথা আছে তা রূপায়ণের জন্য রাষ্ট্র কোনো আইন রচনা করলে তা ১৪ ধারা (আইনগত সাম্যের অধিকার), ১৯ ধারা (ছয় প্রকার স্বাধীনতার অধিকার) এবং ৩১ ধারার (সম্পত্তির অধিকার)[৯] বিরোধী হলেও সেই আইন বাতিল করা যাবে না। সংবিধানের ৩৯(খ) ও (গ) ধারায় যে নির্দেশমূলক নীতির কথা বলা আছে তা হল :

(১) জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য দেশের সম্পদের মালিকানা ও কর্তৃত্ব যাতে বণ্টিত হয় তা দেখতে হবে [৩৯(খ) ধারা];

(২) দেশের অর্থব্যবস্থার পরিচালনার ত্রুটির কারণে সম্পদ এবং উৎপাদনের উপকরণ দেশের মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত হয়ে যাতে জনসাধারণের স্বার্থহানি না-করে, তা সুনিশ্চিত করতে হবে [৩৯(গ) ধারা]।

২৫তম সংশোধনীর উদ্দেশ্য ছিল উপরোক্ত দুটি নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করার পথে বাধা দূর করা। কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য মামলায় (১৯৭৩) শীর্ষ আদালত ২৫তম সংশোধনের ওই অংশকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছে।

মিনার্ভা মিলস্ মামলা

সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে (১৯৭৬) নির্দেশমূলক নীতির ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করা হয়। ৩১গ ধারায় বলা হয়েছিল, সংবিধানের চতুর্থ অংশে উল্লিখিত যে-কোনো নির্দেশমূলক নীতি রূপায়ণের জন্য রাষ্ট্র আইন-প্রণয়ন করলে তা ১৪, ১৯ ও ৩১ ধারায় প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করলেও সেই আইন বাতিল বলে গণ্য হবে না। কিন্তু মিনার্ভা মিলস মামলায় (১৯৮০) সুপ্রিমকোর্ট এই সংশোধনকে অবৈধ বলে বাতিল করে দেয়। শীর্ষ আদালতের যুক্তি ছিল : সংবিধানে মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে যে ভারসাম্য ছিল ৪২তম সংশোধনীতে তা নষ্ট করা হয়েছে। এবং এই ভারসাম্য ভারতের সংবিধানের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মৌল কাঠামো, এই মৌল কাঠামো ধ্বংস করা যায় না।

মিনার্ভা মিলস মামলার এই রায়ের ফলে ১৯৭৬ সালের আগের অবস্থা বলবৎ আছে। অর্থাৎ ২৫তম সংশোধনের ফলে যে দুটি নির্দেশাত্মক নীতির [৩৯(খ) ও (গ) ধারা] প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা চালু আছে। যেমন, ৩৯(খ) ও (গ) ধারায় উল্লিখিত নির্দেশমূলক নীতি রূপায়ণের জন্য রাষ্ট্র আইন-প্রণয়ন করলে সেই আইন ১৪ ও ১৯ ধারায় স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের বিরোধী হলেও তা বাতিল করা যায় না।

৮.৩. নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য

নির্দেশমূলক নীতিগুলি অপ্রয়োজনীয় বলে কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অভিমত

নির্দেশাত্মক নীতিগুলির উপযোগিতা নিয়ে মতভেদ আছে। নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য নয় বলে কেউ কেউ এগুলিকে ভারতের সংবিধানের অপ্রয়োজনীয় অংশ বলে মনে করেছেন। যেমন, বিশিষ্ট ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইভর জেনিংস এগুলিকে সংবিধান রচয়িতাদের 'সাধু উচ্চাভিলাষ' (pious aspirations) ছাড়া আর কিছু নয় বলে মন্তব্য করেছেন।[১০] আর-এক বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কে.সি. হোয়্যারও নীতিগুলির সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এই নীতিগুলি নৈতিক উপদেশ (moral precepts) মাত্র। এগুলিকে নিয়ে আদালতকে মাথা ঘামাতে দিলে তা মূর্খতা হবে।[১১]

৯. সম্পত্তির অধিকার ৪৪তম সংশোধনের (১৯৭৮) দ্বারা বাতিল করা হয়।
১০. জেনিংস : সাম ক্যারাক্টারিসটিক্স অব দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন (১৯৫৩), পৃ. ৩১।

অন্যদিকে, অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলির উপযোগিতা আছে। যেমন, *প্রথমত*, গ্র্যানভিল অস্টিনের মতে, মৌলিক অধিকারের মতো নির্দেশমূলক নীতিগুলিরও উদ্দেশ্য সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া।

দ্বিতীয়ত, বি.এন. রাউ মনে করেন যে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হল রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি কিছু নৈতিক উপদেশ। যদিও সংবিধান নৈতিক উপদেশ প্রদানের জায়গা নয়, তবু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, বহু আধুনিক সংবিধানে এই ধরনের নৈতিক উপদেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর মতে, এগুলির শিক্ষাগত মূল্য আছে। পানিক্করের মতে, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে মনে করিয়ে দেয় যে, সামাজিক নিরাপত্তা ও সর্বজনীন শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে, জীবনযাত্রা ও জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন করতে হবে এবং নারী শিশু ও অনগ্রসর শ্রেণিসমূহ ও উপজাতিদের প্রতি বিশেষ কর্তব্য পালনের ওপর জোর দিতে হবে।

তৃতীয়ত, সংবিধান প্রণেতাদের অন্যতম বি.আর. আম্বেদকরের অভিমত হল, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল জনমতের চাপে নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে উপেক্ষা করতে পারবে না। তাঁর মতে, এ কথা ঠিকই যে, শাসক দল নীতিগুলি অমান্য করলে আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে না, কিন্তু নির্বাচনের সময় ভোটদাতাদের কাছে শাসক দলকে জবাবদিহি করতে হবে।

চতুর্থত, সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন মামলায় রায় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নির্দেশমূলক নীতির উপযোগিতা সম্পর্কে ভারতের বিচারবিভাগের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটেছে। এর অর্থ এই নয় যে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। আসলে বর্তমানে ভারতে আদালত—বিশেষত শীর্ষ আদালত—মৌলিক অধিকারের পরিধি স্থির করতে গিয়ে নির্দেশমূলক নীতিকে উপেক্ষা করছে না। বরং মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতি উভয়কেই যাতে কার্যকর করা যায় তার জন্য সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যার নীতির (principle of harmonius interpretation) ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আদালত অধিকার ও নীতিগুলিকে পরস্পরবিরোধী মনে না-করে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে গণ্য করছে। উদাহরণ হিসেবে সংবিধানের ২১ ধারায় উল্লিখিত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে সুপ্রিমকোর্টের অভিমতের উল্লেখ করা যায়। সংবিধানের ২১ ধারায় জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার বলতে শুধু বেঁচে থাকা বোঝায় না, বোঝায় মর্যাদার সঙ্গে বাঁচা এবং মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য যেসব অধিকারকে আদালত অপরিহার্য বলে মনে করেছে সেইসব অধিকারকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন, শিশুর পূর্ণ বিকাশের অধিকার, যে-কোনো ব্যক্তির আশ্রয় পাবার অধিকার, দূষণমুক্ত জল ও বায়ুর অধিকার প্রভৃতি। জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারের এই যে নতুন ব্যাখ্যা সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন মামলায় সুপ্রিমকোর্ট দিয়েছে, তার ভিত্তি হল বিশেষত ৩৯(ঙ), (চ), ৪১, ৪২ প্রভৃতি ধারায় বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি।

○ উপসংহার

এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অংশে সন্নিবিষ্ট রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংবিধানের অপ্রয়োজনীয় প্রত্যঙ্গ নয় বরং এগুলি সংবিধানের সৃজনশীল অংশ।

Scanned with CamScanner